# রংধনু

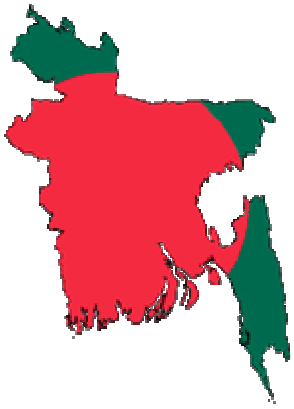

১৬ই ডিসেম্বর, ২০০৯

## "বিশেষ বিজয় দিবস সংস্করণ"

# বাংলাদেশ কেন্দ্র

সেইন্ট-পিটার্সবার্গ,রাশিয়া।

## সবাইকে মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা

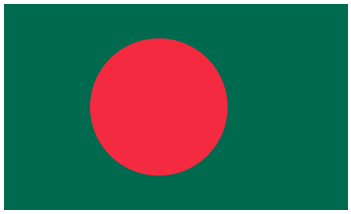

# ঐ ছোটলোকের পোলাটা কিন্তু বীরপ্রতীক ছিল

অমি রহমান পিয়াল,সাংবাদিক ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক। এ বছরের ২৫ মে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বারান্দায় মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট করছিলেন শহীদুল ইসলাম। দুটো কিডনিই অকেজো, পানি এসে গেছে গোটা শরীরে। আশে পাশে মুমূর্ষ রোগী এমন শ'খানেক প্রতিদিনই ছটফট করে। ডাক্তার-নার্স-ওয়ার্ডবয়দের চোখ সওয়া। নতুন করে টানে না। ছটফটানি একসময় থামে। স্বজনদের আহাজারি বলে দেয় শহীদুল ইসলাম আর নেই। কুকুরের মতো জীবন যাপন করে, কুকুরের মতো মৃত্যুবরণ করা শহীদুল ইসলামের দাফনটা আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলামের হাতে হয়নি। বরং রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় কবরে শুয়েছেন। ঢাকা মেডিকেলের ডাক্তার-নার্স-ওয়ার্ড বয়রা হয়তো খবরের কাগজ পড়ে জেনেছেন সেটা। জেনে আশ্চর্য হয়েছেন। কারণ ওই যে ঘন্টার পর ঘন্টা বারান্দায় ছটফট করা, আর্তনাদ করা লোকটা নাকি নামকরা মুক্তিযোদ্ধা ছিলো। শহীদুল ইসলাম ওরফে লালু। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সর্বকনিষ্ঠ বীরপ্রতীক ছিলেন।

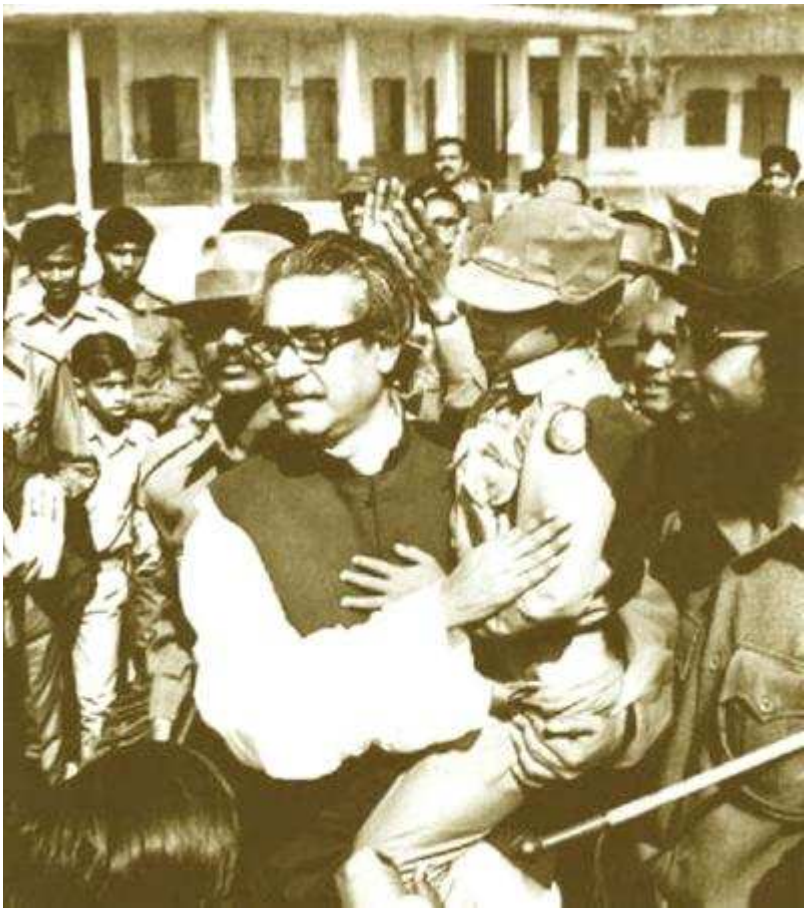

পরদিন দেশের সর্বোচ্চ প্রচার হওয়া দুটো বাংলা ও ইংরেজী দৈনিকে পুরো পাতা জুড়ে মুক্তিযুদ্ধের চিঠি সংকলনের বিজ্ঞাপন ছিলো। বাংলা কাগজে শহীদুল ইসলাম লালুর জায়গা হয়েছিলো একদম ভিতরের দিকে ১৯-এর পাতায় এক কলাম কয়েক ইঞ্চির একটা খবরে। ইংরেজী পত্রিকাটির হয়ে সংবাদটি যোগান দিয়েছেন তাদের বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা। তারপরও মিডিয়াকে সার্বিকভাবে দুষবার জো নেই। এ বছর ২৭ মার্চ প্রেস ক্লাবে শহীদুল ইসলাম লালুকে চিকিৎসা বাবদ খোক টাকা দিয়েছিলেন সাংবাদিকরা। শেরে বাংলা নগর কিডনী হাসপাতালে তাকে ভর্তি ও চিকিৎসা খরচ চালিয়েছেন দুই টিভি সাংবাদিক খন্দকার ইসমাইল ও হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ। কিন্তু ব্যয়বহুল এই চিকিৎসা কতদিন আর ব্যক্তি উদ্যোগে সম্ভব। ঢাকা মেডিকেলে ট্রান্সফার করা হয় তাকে। সেখান থেকে ফিরে যান বাড়িতে। বাড়ি বলতে মীরপুর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে ময়লার ঢিবির ওপর কোনোমতে চালা টাঙ্গিয়ে চার ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকা। সেটাও কর্তৃপক্ষের দয়ার দান। লালু আদায় করে নিতে পারেননি তার বীরপ্রতীক সনদের জোরে। খুব ক্লেশভরেই বলেছিলেন-

আমার খিকা অল্প বয়সী লোকজন মুক্তিযোদ্ধা ভাতা তুলে। কিভাবে তুলে! আমি ১২ বছর বয়সে যুদ্ধ করছি, তারা কত বছর বয়সে করছে? রাজনীতির কারণে মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় কত ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা ঢুইকা গেছে, তারা ভাতাও তোলে। আর আমার পোলাপাইন না খাইয়া থাকে। কি করুম, আমি মূর্খ মানুষ। ছোটো লোকের পোলা।

লালুর কণ্ঠে বিস্ময় নয়, মেনে নেওয়া ছিলো। তিনি নিজেই কি জানতেন তার কৃতিত্বের কথা! '৯৮ সালের দিকে ছাপড়া হোটেলের কড়াইয়ে হাতা নাড়তে নাড়তে টিভির দিকে নজর যায়, শোনেন যুদ্ধে বীরত্বের জন্য খেতাব পাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সরকার ভাতা বরাদ্দ করেছে। ক্যাশে বসা মালিকের ছেলের কাছে জানতে চান বিস্তারিত। বাবুর্চির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের কি সম্পর্ক থাকতে পারে তা হয়তো হোটেল কর্তার মাথায় ঢোকে না। সে হুড়ো দেয়। কাজে যেতে বলে। টিভিতেই চোখে পড়ে কাদের সিদ্দিকী। তার একসময়কার কমান্ডার। একাত্তরে এই বাঘা সিদ্দিকীর কাদেরিয়া বাহিনীর তান্ডবেই গোটা টাঙ্গাইল আর মধুপুর অঞ্চল জুড়ে তটস্থ থাকতো পাকিস্তান সেনাবাহিনী। লালু গোছগাছ সারেন, কমান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

দীর্ঘদিন পর লালুকে দেখে অবাক হন কাদের। তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেন তখনকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। লালু জানতে পারেন তার বীর প্রতীক খেতাবের কথা। তাৎক্ষণিক কিছু পদক এবং অর্থ জোটে। জোটে পরের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার তরফেও। কিন্তু খেতাব আর পদক ধুয়ে তো পেট চলে না। সংসার চলে না। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সরকার ঘোষিত ভাতার একটি পয়সার মুখও তার দেখা হয়নি। তার জোটেনি। 'আমি ভাই স্বীকৃতির জন্য কিংবা ভাতা পামু বইলা যুদ্ধ করি নাই। দেশরে ভালোবাইসাই করছি। আমার চাওয়া বলতে আমার সন্তানগুলান যেন মাথা উচু কইরা এই সমাজে চলতে পারে।' সেই সম্ভাবনা ক্ষীন। মৃত্যুর কয়েকমাস আগে থেকেই বেতন দিতে না পারায় স্কুল থেকে নাম কাটা গেছে লালুর ছেলের। সে হয়তো বাবার মতোই বাসন ধোয়, গ্লাস মাজে। দিন শেষে কিছু খাবার এনে মা আর তিন ভাইবোনের সঙ্গে ভাগ করে খায়। শহীদুল ইসলাম লালু বীরপ্রতীকের সন্তান।

লালু নিজেও এর ভেতর দিয়ে গেছেন। পড়াশোনা জানেন না। যুদ্ধের পর ওয়ার্ডবয়ের চাকুরী নিলেন টাঙ্গাইল হাসপাতালে। '৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সব এলোমেলো হয়ে গেলো। কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্যদের তখন খোঁজা হচ্ছে। কাদের সিদ্দিকী ফেরার। কমান্ডারের নির্দেশনা পাওয়ার কোনো উপায় নেই। লালুও পালালেন। নরসিংদি-চট্টগ্রাম-ময়মনসিং-নারায়নগঞ্জ-ঢাকা। কখনও রেলস্টেশনের কুলি। কখনও ৩০ টাকা মাসকাবারিতে গ্লাসবয়ের কাজ, কখনও রাধুনি। এই দারিদ্রতার মাঝেই মুন্সীগঞ্জের মালা বেগমকে ঘরে আনেন। একে একে জন্ম নেয় চার সন্তান-দুই ছেলে, দুই মেয়ে।

পাকিস্তানী কয়েদ থেকে দেশে ফেরার পর বঙ্গবন্ধুর কোলে ওঠার সৌভাগ্য হয়েছিলো একজন মুক্তিযোদ্ধারই। শহীদুল ইসলাম লালু। কি তার বীরত্ব? একটু পেছন থেকেই বলা যাক। যুদ্ধের সময় ভেঙ্গুল কেরমাজানি বাজারে লালুর চোখে পড়ে মুক্তিযোদ্ধা আনোয়ার হোসেন পাহাড়ির দল। 'আমারে আপনাগো লগে লন'-আব্দার তার। এত ছোটো ছেলে যুদ্ধ করবে কি। লালুর তাতে কিছু যায় আসে না, সে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে ফাইফরমাশ খাটা শুরু করে দেয়, অস্ত্রশস্ত্র পরম যত্নে পরিষ্কার করে। পাহাড়ি এরপর সদলে সীমান্ত পাড়ি দেন। মেঘালয়ের তুরাতে ট্রেনিঙ নেন। লালুও জুটে যান। তার কাজ ছিলো ভোরে উঠে হুইসেল বাজিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্যারেডের জন্য ডাকা। এরপর জাতীয় পতাকা টাঙ্গানো আর জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া। তার সঙ্গী ছিলো সমবয়সী আরেক কিশোর বুলু। দুজনকেই বিচ্ছু বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ট্রেনাররা তাদের শেখান কিভাবে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়, অস্ত্র চালাতে হয়, গ্রেনেড ছুঁড়তে হয়, শত্রুর গতিবিধির খবর নিতে হয়। আসার পথেই মাইনকার চরে কাদের সিদ্দিকীকে প্রথম দেখেন লালু। ২৫ দিনের ট্রেনিং শেষ করে তার দলে ভিড়ে যান।

অপারেশন গোপালপুর থানা নামে মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের ঘটনাটি একান্তই শহীদুল ইসলাম লালুময়। যুদ্ধের উত্তুঙ্গ দিনগুলোতে গ্রুপ কমান্ডার পাহাড়ি তাকে নির্দেশ দেন গোপালপুর থানার হালহকিকত জেনে আসতে, মুক্তিযোদ্ধারা কিভাবে তা দখল করতে পারে। লালু গিয়ে সেখানে তার এক দূর সম্পর্কের তুতো ভাই সিরাজের দেখা পান। সিরাজ পাকিস্তানী সেনাদের দালালী করে, তাকেও একই কাজ করার প্রস্তাব দেয়। লালু রাজী হয়ে যান। পরের দফা তিনটি গ্রেনেড নিয়ে থানায় হাজিরা দেন তিনি। অল্পবয়স বলে তাকে চেক করা হয় না। মুক্তিযোদ্ধাদের আগেই জানান দিয়ে রেখেছিলেন তার অভিপ্রায়। পুরো

পুলিশ স্টেশন একবার চক্কর মেরে এসে, এক বাংকারে প্রথম গ্রেনেড চার্জ করলেন লালু। ভীত ও হতভম্ব পাকিস্তানীরা আন্দাজে গুলি ছুড়তে শুরু করে লক্ষহীন। শুয়ে লালু দ্বিতীয় গ্রেনেডটি ছোড়েন, কিন্তু এটা ফাটে না। এখান থেকে আর বেরুনো হবে না- এই ভয় পেয়ে বসে তাকে। তারপরও তৃতীয় গ্রেনেডটি সশব্দে ফাটে আরেকটি বাংকারে। এদিকে মুক্তিযোদ্ধারাও এগিয়ে এসেছেন। গোলাগুলির এই পর্যায়ে সিরাজ এসে লালুকে একটি অস্ত্র ধরিয়ে দেয়, জিজ্ঞেস করে চালাতে পারে কিনা। লালু তাকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি করেন। এই ঘটনায় কিছু পাকিস্তানী পালায়, কিছু ধরা পড়ে, মারা যায় অনেক। হতাহতের মধ্যে দিয়েও মুক্তিযোদ্ধারা দখল করে নেন গোপালপুর থানা। বলতে গেলে শহীদুল ইসলাম লালুর একক কৃতিত্বে।

এইভাবে একদিন দেশ স্বাধীন হয়। মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্র জমা দেয়। জাতির জনককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতা বিরোধীরা ঠাটে ফেরে। আর লালুদের ঠাই হয় আস্তাকুড়ে। সেখানেই একদিন তারা ধুকে ধুকে মরে যায়। যে পতাকার জন্য জীবনবাজি, মরণের পর সেটা কফিনে মোড়ক হয়। এই বাংলাদেশে একজন মুক্তিযোদ্ধার এটাই রাষ্ট্রীয় সম্মাণ। মরোণত্তর যদিও।

কৃতজ্ঞতা : নজরুল ইসলাম, ছবি : বঙ্গবন্ধুর কোলে শহীদুল ইসলাম লালু (আফতাব আহমেদ)

# ফিরে দেখা ৭১

বাঙ্গালীর গোল্ডফিশ মেমোরীকে আরেকবার ঝালিয়ে নেওয়া যাক। আজ আমরা স্বাধীন দেশে, মুক্ত বাতাসে যে শ্বাস গ্রহন করছি তার পিছনে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের যে আত্মত্যাগ তা আমরা ভুলতে বসেছি। আজ এই দেশের নতুন প্রজন্মের অনেকেই তাদের পূর্বসুরীদের অবদান সম্পর্কে ধারনা রাখে না। যে পরিমান ক্ষয়ক্ষতি আর বিসর্জনের মাধ্যমে এই সার্বভৌম ভূ-খন্ডটির জন্ম তা আরেকবার স্মরণ করি। আমাদের অনাগত প্রজন্মের জন্য এই আত্মত্যাগের স্বরুপ উপলব্ধি করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা অনেকেই উপলব্ধি করতে পারিনা। আজও বাতাসে নীরবে হাহাকার ছড়িয়ে দেয় সেই সংগ্রামের দিনগুলি। কারও কানে পৌছায়, কারো কানে পৌছায় না। অথচ নিজস্ব স্বকীয়তা ও জাতীস্বত্বার উন্মেষ ঘটাতে হলে আমাদের এই মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া বড় প্রয়োজন। সময়ের স্রোতে, কালের গর্ভে বিলীয়মান দেখা অদেখার দোলাচলে আজ আমাদের চেতনা মৃতপ্রায়। তাই ঝালিয়ে নেয়া যাক আবার সেই একাত্তরের দিনগুলি। নিজেকে ভুলতে বসা জাতীস্বত্তা নিজেকে আবার দেখুক।

খুবই মর্মান্তিক লাগছে, নয় কি? আমরা তাদের এ আত্মত্যাগের প্রতিদান দেওয়া তো দূরের কথা বরং আজ তারা আমাদের হাতেই নির্যাতিত। যারা আমাদের স্ব
গ্রহনের স্বাধীনতা এনে দিল, তাদের জন্য আমরা কি করেছি?

তিরিশ লক্ষ প্রাণ আর দুই লক্ষ নারীর সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত এ মাতৃভুমির যথাযোগ্য মর্যাদা কি আমরা দেই? আমরা কি প্রকৃত অর্থেই হৃদয়ে লালন করি দেশপ্রেম? আমরা কি সত্যিই উপলব্ধি করি আমাদের পূর্বসূরীরা কি পরিমাণ আত্মত্যাগ করে গেছেন আমাদের জন্য? আমরা আজ কোথায়? আমাদের এ অবক্ষয়ের পিছনে কি অনেকটা আমাদের জাতীসত্তাকে, জাতীয় ইতিহাসকে নীরবে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দায়ী নয়? মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত আমরা থ্রী নট থ্রী রাইফেল দিয়ে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত পাক হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করেছি। মা নিজ মাতৃস্নেহ বিসর্জন দিয়ে ছেলেকে যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। সেই ছেলে আর ফিরে আসেনি। কত মায়ের আত্মত্যাগ এর পিছনে আমরা কি তা ভাবি? আজ আমাদের সূর্যসন্তান মুক্তিযোদ্ধারা কেন পদে পদে অবহেলিত? কেন এত সাহসী বাঙ্গালী জাতী আজও বিশ্বের দরবারে সগর্বে মাথা তুলে দায়ায় নি? কেন আমরা নিজেরাই নিজেদের কাছে অবহেলিত?

আজ এই বিজয়ের দিনে আসুন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, আমরা আমাদের এ আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দেব না।

# বীভৎস যৌন নির্যাতন, কিন্তু এড়িয়ে গেছেন সবাই

একাত্তরে আমাদের নারীদের ওপর পরিচালিত পাকিস্তানি সৈন্যদের যৌন নির্যাতনের ধরন কতোটা ভয়াবহ, কতোটা বীভৎস ছিল- যুদ্ধ চলাকালে এদেশ থেকে প্রকাশিত কোনো দৈনিকে তা প্রকাশিত হয় নি। প্রকাশিত হয়নি বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে পরিবেশিত বাংলাদেশের যুদ্ধ সংবাদেও।

১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পর থেকে জাতীয় দৈনিকগুলোতে পাকিস্তানিদের নারী নির্যাতনের বেশ কিছু সংবাদ প্রকাশিত হলেও ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন নির্যাতনের ধরন, প্রকৃতি, শারীরিক, মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলো নিয়ে খুব কমই গবেষণা হয়েছে। ‘‘স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখন ও দলিল প্রামাণ্যকরন’’ প্রকল্পের তৎকালীন গবেষক, বর্তমানে ইংরেজী দৈনিক ডেইলি ষ্টারের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক আফসান চৌধুরী এজন্য ইতিহাস রচনার সনাতনি দৃষ্টিভঙ্গিকে দায়ী করে বলেছেন, দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখনে বরাবরই সশস্ত্র লড়াই, ক্ষমতাসীন পুরুষদের কৃতিত্ব গ্রন্থিত করার উদ্যোগ চলছে, কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে লাখ লাখ নারী অস্ত্র হাতে যুদ্ধ না করেও যেভাবে যুদ্ধের ভয়াবহতার শিকার হয়েছে, সনাতনি মানুসিকতার কারণে কখনই তা নিয়ে গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যদের যৌন সন্ত্রাসের ধরন সম্পর্কে প্রথম তথ্য পাওয়া যায় ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত আমেরিকান সাংবাদিক সুসান ব্রাউন মিলার রচিত ‘‘এগেইনেস্ট আওয়ার উইল: ম্যান, উইম্যান এন্ড রেপ’’ গ্রন্থে। দেশে এ বিষয়ক গবেষণাকর্ম প্রকাশিত হয় খুব কম এবং যা হয়েছে ৮০ সালের পর থেকে। যুদ্ধের পর ৭৬-৭৭ সাল পর্যন্ত গ্রহণ করা এ বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাক্ষাৎকার একমাত্র প্রকাশিত হয় প্রামাণ্যকরণ প্রকল্পের অষ্টম খন্ডে। কিন্তু এই খন্ড যাচাই করে দেখা গেছে, এতে মোট গৃহীত ২৬২টি সাক্ষাৎকারের মধ্যে নির্যাতনের সাক্ষাৎকার মাত্র ২২টি।

প্রকল্পের তৎকালীন গবেষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, প্রামাণ্যকরণ কমিটি তাদের কার্যালয়ে প্রায় সাড়ে ৩ লাখের বেশি পৃষ্ঠার তথ্য সংগ্রহ করেছে। এরমধ্যে মাত্র ১৫ হাজার পৃষ্ঠা গ্রন্থিত আছে। বাকি লাখ লাখ পৃষ্ঠার তথ্যের মধ্যে নারী নির্যাতন বিষয়ক বেশকিছু ঘটনা আছে। প্রকল্পের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক কে এম মহসীন বলেন, ‘ডকুমেন্টগুলো এখন জাতীয় ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব গ্রহনের পারস্পরিক টানাহেচড়ায় অরক্ষিত অবস্থায় আছে। যতোদূর জানি, বেশ কিছু ডকুমেন্ট চুরিও হয়ে গেছে।’

মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত লিখিত সূত্র, সমাজকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানিদের ধারাবাহিক ধর্ষণ উন্মত্ততার সঙ্গে মধ্য এপ্রিল থেকে যুক্ত হতে শুরু করে এদেশীয় দোসর রাজাকার, শান্তি কমিটি, আল বদর ও আল শামস্ বাহিনীর সদস্যরা। এরা বিভিন্ন স্থান থেকে নারীদের ধরে আনার পাশাপাশি ধর্ষকে অংশ নিয়েছে। প্রত্যেকটি ক্যান্টনমেন্ট, পুলিশ ব্যারাক, স্থায়ী সেনা বাঙ্কার ছাড়াও বিভিন্ন স্কুল কলেজ, সরকারি ভবন ধর্ষণের কেন্দ্র

হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

জানা যায়, একাত্তরে পুরো ৯ মাস পাকিস্তানি সৈন্যরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে ঘটনাস্থলে, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বাঙালি নারীদের ধরে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন আটকে রেখে ধর্ষণের যে ঘটনা ঘটিয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা গণধর্ষণ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাড়ির পুরুষ সদস্য, স্বামীদের হত্যা করার পর নারীদের উপর ধর্ষণ নির্যাতন চালাতো পাকিস্তানী সৈন্যরা। ৯ থেকে শুরু করে ৭৫ বছরের বৃদ্ধা কেউই পাকিস্তানী সৈন্য বা তাদের দোসরদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। সুসান ব্রাউনি মিলার তার গ্রন্থের ৮৩ পাতায় উল্লেখ করেছেন, কোনো কোনো মেয়েকে পাকসেনারা এক রাতে ৮০ বারও ধর্ষণ করেছে। ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির ''যুদ্ধ ও নারী'' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এক একটি গণধর্ষণে ৮/১০ থেকে শুরু করে ১০০ জন পাকসেনাও অংশ নিয়েছে। একাত্তরের ভয়াবহ ধর্ষণ সম্পর্কে একমাত্র জবানবন্দিদানকারী সাহসিক ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী তার সাক্ষাৎকারে (একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি, সম্পাদনা শাহরিয়ার কবির) জানান, ''রাতে ফিদাইর (উচ্চ পদস্থ পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা) চিঠি নিয়ে ক্যাপ্টেন সুলতান, লে. কোরবান আর বেঙ্গল ট্রেডার্সও অবাঙালি মালিক ইউসুফ এরা আমাকে যশোরে নিয়ে যেত। যাওয়ার পথে গাড়ির ভেতরে তারা আমাকে ধর্ষণ করেছে। নির্মম, নৃশংস নির্যাতনের পর এক পর্যায়ে আমার বোধশক্তি লোপ পায়। ২৮ ঘন্টা সঙ্গাহীন ছিলাম''।

পাকিস্তানি সৈন্যদের ধর্ষণের বীভৎসতার ধরন সম্পর্কে পুনর্বাসন সংস্থায় ধর্ষিতাদের নিবন্ধীকরণ ও দেখাশোনার সঙ্গে যুক্ত সমাজকর্মী মালেকা খান জানান, সংস্থায় আসা ধর্ষিত নারীদের প্রায় সবারই ছিল ক্ষত-বিক্ষত যৌনাঙ্গ। বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ছিড়ে ফেলা রক্তাক্ত যোনিপথ, দাঁত দিয়ে ছিড়ে ফেলা স্তন, বেয়োনেট দিয়ে কেটে ফেলা স্তন-উরু এবং পশ্চাৎদেশে ছুরির আঘাত নিয়ে নারীরা পুনর্বাসন কেন্দ্রে আসতো।

পাকিস্তানি সৈন্যরা আমাদের নারীদের একাত্তরে কতো বীভৎসভাবে ধর্ষণসহ যৌন নির্যাতন করেছে তার ভয়াবহতা সবচেয়ে বেশী ধরা পড়ে ১৮ ফেব্র''য়ারীর ৭৪ সালে গৃহীত রাজারবাগ পুলিশ লাইনে একাত্তরে সুইপার হিসেবে কাজ করা রাবেয়া খাতুনের বর্ণনা থেকে। প্রামান্যকরন প্রকল্পের অষ্টম খন্ডে গ্রন্থিত ঐ বর্ণনায় কয়েকটি অংশ: রাবেয়া খাতুন জানান, 'উন্মত্ত পাঞ্জাবি সেনারা নিরীহ বাঙালী মেয়েদের শুধুমাত্র ধর্ষণ করেই ছেড়ে দেয় নাই অনেক পশু ছোট ছোট বালিকাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করে ওদের অসার রক্তাক্ত দেহ বাইরে এনে দুজনে দুপা দুদিকে টেনে ধরে চড়াচড়িয়ে ছিড়ে ফেলে ছিল। পদস্থ সামরিক অফিসাররা সেই সকল মেয়েদের ওপর সম্মিলিত ধর্ষণ করতে করতে হঠাৎ একদিন তাকে ধরে ছুরি দিয়ে তার স্তন কেটে, পাছার মাংস কেটে, যোনি ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে সম্পূর্ণ ছুরি চালিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে ওরা আদন্দ উপভোগ করতো । ' রাবেয়া খাতুনের আরেকটি বর্ণনায় জানা যায়, ' প্রতিদিন রাজারবাগ পুলিশলাইনের ব্যারাক থেকে এবং হেডকোয়ার্টার অফিসে ওপর তলা থেকে বহু ধর্ষিত মেয়ের ক্ষত-বিক্ষত বিকৃত লাশ ওরা পায়ে রশি বেধে নিয়ে যায় এবং সেই জায়গায় রাজধানী থেকে ধরে আনা নতুন মেয়েদের চুলের সঙ্গে বেধে ধর্ষণ আরম্ভ করে দেয়। '

১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পরও পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঙ্কারে আটকে রেখে নির্বিচারে ধর্ষণ করেছে বাঙালী নারীদের। বিচারপতি কে এম সোবহান প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেন, ' ১৮ ডিসেম্বর মিরপুরে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া একজনকে খুঁজতে গিয়ে দেখি মাটির নিচে বাঙ্কার থেকে ২৩জুন সম্পূর্ণ উলঙ্গ, মাথা কামানো নারীকে ট্রাকে করে নিয়ে যাচ্ছে পাক আর্মিরা। '

বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, পুরোপুরি পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত পাক আর্মিদের ধর্ষণ-উত্তর অন্যান্য শারীরিক নির্যাতনের ফলে বেশ কিছু মেয়ে আত্মহত্যা করেছে, কাউকে কাউকে পাকসেনারা নিজেরাই হত্যা করেছে; আবার অনেকেই নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক ড. রতন লাল চক্রবর্তী ৭২- এর প্রত্যক্ষদর্শনের অভিজ্ঞতা থেকে জানান, ' যুদ্ধের পর পর ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী, ফেব্র''য়ারি পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন স্থানে উদ্বাস্তুর মতো ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে বেশ কিছু নারীকে। তাদের ড্রেসআপ এবং চলাফেরা থেকে আমরা অনেকেই নিশ্চিত জানতাম ওরা যুদ্ধের শিকার এবং ওদের যাওয়ার কোনো জায়গা নেই।

***তথ্যসূত্র: উক্ত লিখাটি ভোরের কাগজ, ১৮ মে ২০০২ ইং এ প্রকাশিত***

## বয়ে চলো নিরন্তর, দুঃসহ স্মৃতির প্রহর

## সামছা আকিদা জাহান

আমার এক বন্ধুকে একদিন রাস্তায় এক পাগলীর দিকে গভীর মনযোগ সহকারে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞাস করেছিলাম--- "ওর দিকে কি দেখছ?"
সে বলল-- " না দেখছি।"
এরপর খুব ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল---," আমার শ্বাশুরী মা কে?"

মহান স্বধীনতা যুদ্ধের সময় আমার ঐ বন্ধুর বরের বয়স ছিল পাঁচ বছর। একরাতে ওনার মাকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়।

সেই পাঁচ বছরের শিশুটি এখন ও মায়ের সেই আর্তচিৎকার শুনতে পায়। মাঝ রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে ভয়ে চিৎকার করে কাঁদে।

দেশ স্বাধীন হবার পর তাকে ক্যাম্প থেকে উদ্ধার করা হয়। বাসায় আসার পর একমাত্র আদরের সন্তানকে চিন্তে পেরে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করেন। কাঁদতে কাঁদতেই অজ্ঞান হয়ে যান।

তারপর যখন জ্ঞান ফেরে তখন তিনি সম্পুর্ন অপ্রকিতস্থ। এই আবস্থায় দুই দিন থেকে, তিনি হঠাৎ করেই শান্ত হয়ে যান। একদম চুপচাপ এবং সেই রাতেই তিনি কোথায় যে চলে যান, কেউ খোঁজ পায়নি আর কোন দিন। সেই সময় পত্রিকাতেও তার খোঁজে ছবিসহ খবর ছাপান হয়, কিন্তু কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

সেই পাঁচ বছরের শিশুটি এখন একজন পূর্নবয়স্ক মানুষ---------
আজ তিনি খুঁজে ফিরেন তার মাকে। রেলস্টেশনে, বাসস্টেশনে, ফেরীঘাটে সর্বত্র কোন বয়স্কা পাগলীকে দেখলেই সব ভুলে তার কাছে চলে যান । সারা বংলাদেশে তার দুই চোখ ব্যাকুল হয়ে ঘুরে বেড়ায় একবার মাকে দেখবার জন্য। শুধু একবার।

আমার বন্ধুটি বলল," শুধু ও কেন আমিও খুঁজি, যদি একবার তার দেখা পাই।"

গত জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহনের পর তারা জাতিয় স্মৃতি সৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করলেন এবং শহীদদের সম্মান জানাবার জন্য এক মিনিট নিরবতা পালন করলেন। রাতে টিভিতে এই খবর দেখার পর পরই একটা ফোন এল। ফোনে খুব ভদ্রভাবে আমাকে জানান হল এই সরকার একটা কাজের কাজ করছে। আমি বললাম ,"কি কাজ? ওরা তো সবে মাত্র ওথ নিল!"
আপরপ্রান্তের কথা শোনা গেল, "কেন? টিভি তে খবরে দেখলা না বড় বড় রাজাকারদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে স্মৃতি সৌধে, শহীদদের সম্মান দেখাবার জন্য। তারা শহিদদের সালাম দিয়েছে আবার এক মিনিট নিরবতা ও পালন করেছে?"
আমি বললাম "খুব খুশি মনে হয় তুমি।"
উত্তর পেলাম "বুঝতে পারছি না । সম্পুর্ন বোধ শূন্য।"
আসলেই আমি এখন মানুষ না আমি এখন রোবট। মেমোরীতে যা ডাউনলড করা আছে তার বাইরে কিছু চিন্তা করার এখন ক্ষমতা নাই।

আমি যুদ্ধোপরাধীর বিচার চাই। প্রকাশ্যে বিচার চাই।

---

২রা পৌষ, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ। ১৬ই ডিসেম্বর, ২০০৯ ইং। বাংলাদেশ কেন্দ্র, সেইন্ট-পিটার্সবার্গ, রাশিয়া।

সম্পাদনায় রাজ মো, আশরাফুল হক বারামদী, সেইন্ট-পিটার্সবার্গ ষ্টেট ইউনিভার্সিটি অফ টেলিকমিউনিকেশনস।

প্রুফ-রিডার কিশলয় পাল, সেইন্ট-পিটার্সবার্গ ষ্টেট ইউনিভার্সিটি অফ মাইনিং।

তত্বাবধায়নে জাহিদ আহমেদ মুরাদ, বাংলাদেশ কেন্দ্র, সেইন্ট-পিটার্সবার্গ, রাশিয়া।

একটি বাংলাদেশ কেন্দ্র পরিবেশনা।